# পৌত্তলিক

**এস. ওয়াজেদ আলি**

''এই সেদিন লোকে পঞ্চায়েত করে তোমার ঠাকুর-বাকুর সব ভেঙ্গে দিলে, আবার শুনছি তুমি পুতুল পূজা আরম্ভ করবে!'' যাকে এই কথাগুলি বললুম - সে এক মুসলমান যুবা, বয়স বিশ বৎসর। আমাদের প্রতিবেশী সে। তার নাম আলি হোসেন।

আলি হোসেনের চেহারার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল - যা আমাকে তার দিকে আকৃষ্ট করতো। তার শরীর ছিল পাতলা ছিপ ছিপে, আর মুখখানিও ঠিক সেই ধরনের। মুখাকৃতির মধ্যে এমন একটি শীতলতার ভাব ছিল, যা তার অন্তরের সৌন্দর্য্যটুকুকে সুস্পষ্ট ব্যক্ত করতো। তার কালো টানা চোখ দুটি বিষাদে ভরা, আপন হারা দেখে তাকে ভাবুক বলেই মনে হতো। আমি একটু স্নেহ করতুম বলে মধ্যে মধ্যে সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতো। লোকের কাছে কিন্তু আর অনেক অপবাদ শুনতুম! কেউ তাকে 'পৌত্তলিক' বলতো, কেউ বলতো পাগল, আবার কেউ বা তাকে যাত্রার সঙ্ বলে বিদ্রুপ করতেও ছাড়তো না। একবার পৌত্তলিকতার অভিযোগে গ্রামের পঞ্চায়েতে তার শাস্তিও হয়ে যায়। কথাটা শুনে তার জন্য আমি একটু দুঃখিত হয়েছিলুম। তখন আমার ধারণা হয়েছিল, বোধ হয় হিন্দু লেখকদের লেখা নাটক - নভেল পড়ে ছেলেটার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।

এবার দেশে গিয়ে শুনলুম, সে আবার তার সেই অশ্রুতপূর্ব্ব কাণ্ড কারখানা আরম্ভ করেছে। পাড়াগাঁয়ের গোঁড়ামি আমার জানা ছিল। তার জন্য একটু শঙ্কিত হয়ে তাকে ডেকে পাঠালুম। সে এলে তাকে ঐ কথাগুলি বললুম।

আমিল হোসেন কিন্তু আমার কথার কোন জবাব দিলে না। একটু জড়সড় হয়ে নির্ব্বাকভাবে বসে রইলো। তার আকার - প্রকার দেখে বুঝলুম, সে একটা ভীত ও সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছে; কথা বলতে সাহস করছে না। সমবেদনার সুরে বল্লুম- আমার কাছে তোমার ভয় কি আলি হোসেন? আমার সঙ্গে কথা বলতে কেন কুণ্ঠিত হচ্ছ? আমাকে ত তুমি ছেলেবেলা থেকে জান। খুলে সব কথা আমায় বল, দেখি, তোমার জন্য কিছু করতে পারি কিনা।

আলি হোসেন আক্ষেপের সুরে বললে, ''সাহেব, ভয় হয় আবার কোন দিন আমার উপর কি জুলুম - জবরদস্তি হবে। আপনি তখন দেশে ছিলেন না। আমি দেওয়ালে একটা কালীর ছবি টাঙ্গিয়ে ছিলুম। কারও তাতে কোন অনিষ্ট হতো না। কোথাকার একটা চ্যংড়া ছেলে এসে ছবিখানির উপর গাঁদা ফুলের মালা দেখে তার সঙ্গীদের গিয়ে খবর দিলে, হুড়মুড় করে অমনি ছেলে-ছোকরা যুবা-বৃদ্ধ সদলে এসে সেই ছবিটি দেখে গেল; আর রক্ত চক্ষে আমাকে শাসিয়ে গেল। ভয়ে আমার বুক দুর্-দুর্ করে কাঁপতে লাগলো।

পরদিন পঞ্চায়েতের বৈঠক হলো। আমার ডাক পড়লো। আমি কাঁপতে কাঁপতে সেখানে হাজির হলুম। দেখলুম, দেশের গণ্যমান্য দশজন গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। আর তাদের চারিপাশে ছোট বড় যত লোকের মস্ত-এক সভা জমেছে। বিনীতভাবে সভার গণ্ডীর বাইরে আমি চুপ করে দাঁড়ালুম। আমি আসতেই সেখানে একটা কলরব শুরু হলো। গোলমাল একটু কমলে রইস হোসেন বক্স খাঁ আমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বল্লেন, ''আলি হোসেন, একটি কথা! তোমার বিরুদ্ধে পুতুল - পূজার অভিযোগ শুনতে পাচ্ছি কেন? মুসলমানের ছেলে কাফেরের কাজ! এমন কথা আমাদের দেশে তো কেউ কখনও শোনেনি। তোমার যোগ্য সাজা হওয়া উচিত। তোমার এ বিষয়ে কিছু বলবার থাকে তো বল। আমরা শুনতে প্রস্তুত আছি।''

রইসের কথা শেষ হতে না হতেই কেউ চীৎকার করে উঠলো, ''ওকে চাবুক মারা হোক'। কেউ বল্লে, ''ওর কান মলে দাও, আর ও নাকে খদ দিক।'' কেউ বললো ''ওকে দেশ থেকে দূর করে দাও।'' মোট কথা যার যা মনে এলো, সে তাই বলতে লাগলো। রোষে ঘৃণায় সেই জনমণ্ডলী তখন ক্ষুধাতুর নেকড়ে বাঘের দলের মতে রক্ত পিপাসু হয়ে উঠেছিল। আমার কথা বলবার, কিম্বা আত্মপক্ষ সমর্থন করবার সাহস একেবারেই হলো না। আমি হাত জোড় করে নত শিরে দাঁড়িয়ে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে রইস সাহেব বল্লেন, ''আচ্ছা, ও ছেলেমানুষ এবারকার মত ওকে মাপ করা যাক। ভবিষ্যতে যদি আবার ওরকম করে তা হলে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যাবে। আপতত ছবিটি এনে ওর সামনেই নষ্ট করা হোক।''

কথা শেষ হতে না হতে চার - পাঁচজন লোক গিয়ে ছবিখানি নিয়ে এল আর আমার সামনেই সেটাকে মহা ধূমধামে নষ্ট করলে। তারপর সভা ভঙ্গ হলো। এত অল্পে নিস্তার পাবো, আশা করিনি। আল্লাহকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে দিতে বাড়ী ফিরলুম। কেবল ছবিখানির জন্য আমার মনে ভারী দুঃখ হতে লাগলো।''

আমি হাসতে হাসতে বল্লুম, ''তা সে ভালো। তবে একবার অমন শিক্ষা পেয়েও আবার এ কাজ কেন আরম্ভ করেছে?''

এক ইতস্ততঃ করে আলি হোসেন বললে, ''সব কথা বলতে আমার বড় লজ্জা হয়।''

আমি বল্লুম, ''অবাধে বলে যাও! আমার কাছে তোমার কোন ভয় নেই, আর আমাকে লজ্জা করবারও কোন কারণ নেই, আমাকে যা বলবে, তা বাইরে যাবে না।''

আলি হোসেনের ভাব - ব্যঞ্জক মুখে আশ্বাসের এক টুকরো ক্ষীণ হাসি দেখা দিল। আর্দ্র কণ্ঠে সে বলতে লাগলো, ''আপনার মত জ্ঞানী লোকের কাছে আমি বিপদের আশঙ্কা করি না। আপনার কাছে অবশ্য আমার লুকোবার কিছু নেইও। সবই আপনাকে বলছি। কারও কাছে অন্তরের কথা বলবার জন্য আমারও প্রাণ ছটফট করছিল। মানুষের মনের মধ্যে কিছু বলবার থাকলে সেটা কাকেও না বলে সে শান্তি পায় না। আমারও তাই ঘটেছে। এখন আপনাকে সব কথা খুলে বললে হয়তো আমি একটু শান্তি পাবো।''

আমি মবলুম, ''বেশ, ''আমার হাতে এখন কোন কাজ নেই, এসো, তোমার কথা শুনি।''

আলি হোসেন বললে, ''আশা করি, আমাকে পাগল মনে করবেন না। আল্লাহ আমাকে কালীর মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ দেখা দিয়েছেন।''

আমি স্তম্ভিত হয়ে বল্লুম- ''সে কি কথা! তুমি বলল কি! পাকা মুসলমানের ঘরে তোমার জন্ম, তুমি আল্লাহকে কালীর মূর্ত্তিতে কি করে দেখতে পেলে, এ সব আজগুবি কথা তোমার মাথায় কে ঢোকালে? আজকাল হিন্দুদের পুরান - টুরান খুব পড়ছো বুঝি?''

আলি হোসেন বললে, ''তাইতো বলছিলুম, আপনি হয়তো আমাকে পাগল মনে করবেন।''

মুকপাষাণ মূর্ত্তির মত আবার সে চুপ করে বসে রইল। দেখলুম, তার কথায় বাধা দিয়ে ভুল করেছি। একটু অনুতাপের সুরে বললুম, ''আলি হোসেন কিছু মনে করো না। তোমার কথা শুনে একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলুম। আমাকে তোমার সব কথা বলতে কুণ্ঠিত হয়ো না। আমি মন দিয়ে শুনছি।''

আমার কথা শুনে সে অনেকটা আশ্বস্ত হলো। একটু পরে সে আবার বলতে আরম্ভ করলে, ''বিস্মিত হবার কথা বটে! যাক আমি সব বলছি, আপনি একটু ধৈর্য্য ধরে শুনুন।

আপনি জানেন গোঁড়া মুসলমানের ঘরে আমার জন্ম। আমার বাপ-মা দুইজনেই রোজা-নামাজ প্রভৃতি ধর্ম্মের সমস্ত ক্রিয়া - কর্ম্মে নিষ্ঠাবান ছিলেন। আর এসলামের উপর তাঁদের ভক্তি ছিল অসীম। সাধারণ মুসলমান ছেলেদের মত আমিও মক্তবে কোরান শরীফ পড়তে শিখি। আমার সহপাঠীদের সঙ্গে নামাজ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগ দিতেও ত্রুটি করিনি। মোট কথা, খাঁটি মুসলমান আবহাওয়াতেই আমি প্রতিপালিত হয়েছি। ছেলেবেলা থেকে কিন্তু সঙ্ সাজবার আর সঙ্ দেখবার এক উৎকট প্রবৃত্তি আমার মনে জাগতো। কোথাও কোন তামাসা হচ্ছে শুনলে আমি সেখানে না গিয়ে থাকতে পারতুম না। এ জন্য আমি বাড়ীতে কতবার মার খেয়েছি, কতবার তিরস্কার সহ্য করেছি। কিন্তু কিছুতেই আমার এই প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারিনি। যখন শুনেছি কোথাও নাচ হচ্ছে, তামাসা হচ্ছে, থিয়েটার যাত্রা হচ্ছে, তখনই সেখানে গিয়েছি, আর সেই সবের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। রণস্থলে যা দেখেছি বাড়িতে এসে তার পুনরাভিনয় করে যে কি আনন্দ পেয়েছি, তা বলতে পারি না। এই সবরে মধ্যেই আমি স্বর্গের আনন্দ পেয়েছি। আর এ সব থেকে যখন আমাকে বাধ্য করে দূরে রাখা হয়েছে তখন নরকের যন্ত্রণা যে কি, তাও বুঝতে পেরেছি।''

আমি বললুম বললে, ''নাচ - তামাসা অবশ্য সব ছেলেরাই ভালোবাসে, এর মধ্যে তোমার কোন বিশেষত্ব তো দেখছি না।''

আলি হোসেন বললে, ''নাচ-তামাসা অবশ্য সব ছেলেরাই ভালবাসে কিন্তু আমার মনের অবস্থা অন্য ছেলেদের চেয়ে বরাবরই একটু ভিন্ন রকমের ছিল। শুনে বোধ হয় আশ্চর্য্য হবেন, ছেলেবেলা থেকে এখন পর্য্যন্ত সব তামাসাই আমার কাছে প্রকৃত জীবন বলে মনে হয়েছে, আর সংসারের এ বাস্তব জীবনটাকে বরাবর আমি সব তামাসার মত তুচ্ছ করেই দেখেছি।''

আমি বললুম, ''সে কি কথা, -এ কি করে হতে পারে?''

আলি হোসেন বললে, ''তাইতো বলছিলুম, অন্য লোকের অবস্থার সঙ্গে আমারঅবস্থার একটু তফাৎ আছে?''

আলি হোসেন কিছুক্ষণ নির্ব্বাক রইল, তার বড় বড় চোখ দুটী যেন তার অন্তরনিহিত কোন কুহকী দৃশ্যপটের মধ্যে নিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হলো, আমার সঙ্গে সে যে কথা কচ্ছে, সেই বাস্তবতাটুকু ভুলে সে কোন সুদূর অবাস্তবের দেশে চলে গেছে। তাকে একটু জাগিয়ে তোলবার জন্য বললুম, ''কি বলছিলে হে? গল্পের মাঝখানে এসে চুপ করে বসে রইলে যে! তোমার গল্প আমার বেশ ভাল লাগছে।''

নিদ্রোত্থিতের মত একটু চমকিত হয়ে আহি হোসেন বলে উঠল 'কথার খেই হারিয়ে ফেলেছি। কি বলছিলুম আপনাকে?'

আমি বললুম, 'বাস্তব জগৎ তোমার কাছে সঙ-তামাসার মত দেখায়, আর সঙ্ তামসার জগৎকেই তুমি বাস্তব বলে মনে কর।''

আলি আলি হোসনে বললে, ''হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে। সেই কথা ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। তা আমি আপনাকে আমার মনের প্রকৃত অবস্থার কথা বলছিলুম। ছেলেবেলা থেকে সঙগুলোকেই আমার মনের যথার্থ প্রতিবেশী বলে আমি মনে করেছি। আর নিজেকেই তাদেরই একজন বলে মনে করতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। সমাজের এই রক্ত - মাংস বিশিষ্ট মানুষগুলো আমার অনুভূতিতে কল্পপ্রসূত অলীক ছায়ার মতই দেখিয়েছে। তাদের কুজ্ঝবটিকাচ্ছন্ন জগৎই যে বাস্তব জগৎ সেকথা আমি কখনও যথার্থভাবে অনুভব করতে পারিনি। এটা আমার অনুভূতির এক মস্ত দোষ, তা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু কি করি, আমি নিরূপায়। নিজের স্বভাব ছেড়ে তো আর পালাতে পারি না। আমি যত গল্পকাহিনী পড়ি, চরিত্রগুলিকে মিলিয়ে দিই। আর তারা সকলে মিলে আমার মনের মধ্যে কত রকমের অভিনয় যে করতে তাকে, তা বলে শেষ করতে পারি না। কখনও তারা কোন রাজ্যের মধ্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করে, কখনও তারা ভালবাসাবাসিতে মেতে যায়, কখনও ধর্ম্ম নিয়ে, রাজ্য নিয়ে কিম্বা কোন লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডে তারা সকলে লিপ্ত হয়, কখনও তারা অট্টহাসি হাসে, কখনও বা আবার তারা নৃত্যের প্রাণ মাতানো তালে পা তুলে নাচতে থাকে। এ সব দৃশ্য আপনা থেকেই আপনার মনের মধ্যে মূর্ত্তি গ্রহণ করে। দৃশ্যের চরিত্রগুলি এমন সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তাদের আমি আর কল্পনার জীব বলে মনে করতে পারি না। তাদের সাহচর্য্যে আমি এত আনন্দ পাই যে, তাদের ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়। সমাজকে ছেড়ে, মানুষকে ছেড়ে বিরলে বসে আমি তাদের সঙ্গেই কাল কাটাতে ভালবাসি।''

কথাগুলি বলতে বলতে আলি হোসেনের চোখ দুটি যেন জ্বলতে লাগলো। তার কপালের স্নায়ুগুলি স্ফীত হয়ে উঠলো। তার ওষ্ঠদ্বয় উত্তেজনার কাঁপতে লাগলো, তার সমস্ত কলেবর যেন কোন বৈদ্যুতিক স্পর্শে ক্রীড়াময় হয়ে উঠলো। আমি মনে মনে তার সাধুবাদ না করে থাকতে পারলুম না। তাকে তখন কল্পনার এক মূর্ত্তিমান বিগ্রহের মত দেখাচ্ছিল। আমি বল্লুম, ''বেশ, তোমার কথা শুনে আমি যথার্থ আনন্দ পেলুম। তুমি যে একজন প্রকৃত কবি, তাতে সন্দেহ নাই। আশা করি কালে তুমি সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করবে। কিন্তু পুতুল পূজার সঙ্গে এ সবের কি সম্বন্ধ? পুতুল পূজা ত এক রকম পৃথিবী থেকে উঠেই গেছে, অন্যের কথা কেন, শিক্ষিত হিন্দুরাও এখন ওসব ছাড়তে বসেছে।''

আলি হোসেন বললে, ''আমার মনের অবস্থা এখনও ঠিক আপনি বুঝতে পারেননি। কল্পনার চরিত্রগুলিই যে আমার মনের মধ্যে তাদের লীলা - খেলা করে থাকে, তা নয়। ঈশ্বরকেও আমি আমার এই মানস রাজ্যে দেখতে পাই। তিনি সেখানে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য যথা সময়ে উপযুক্ত আড়ম্বরের সঙ্গে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। কিন্তু আমার কল্প-রাজ্যের অন্য অধিবাসীদের মত তাকেও আমি শরীরী অবস্থাতেই দেখে থাকি। তাঁর নায়িকার সত্তাকে আমি আমার ধারণার মধ্যে আনতে পারিনি।

আগেই বলেছি, ছেলেবেলা থেকে থিয়েটার - যাত্রা প্রভৃতি দেখার আমার বিশেষ এক ব্যাধি আছে। সেখানে দেবদেবীদের যে মূর্ত্তি দেখেছি তারাই আমার কল্পনার সঙ্গেও ঈশ্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ধর্ম্মের পালন আর অধর্ম্মের শাসন করে থাকেন। কঠিন সামাজিক অনুশাসন সত্ত্বেও আমি তাঁদের কখনও আটকে রাখতে পারিনি। ধর্ম্মের চিন্তা এলেই তাঁদের প্রতিমাগুলি অতি স্পষ্ট হয়ে আমার মনের মধ্যে ফুটে ওঠে। এজন্য পূর্ব্বে আমি মধ্যে মধ্যে মনে মনে বড় লজ্জিতও হতুম। ভাবতুম মুসলমানের ছেলে হয়ে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিকে মনের মধ্যে স্থান দিয়ে বড় পাপ করেছি। কিন্তু তাঁদের আটকে রাখবার শক্তি আমার ছিল না।

এখন যে অলৌকিক ঘটনা আমার মনকে একেবারে বদলে দিয়েছে আর যার নির্দ্দেশ মত কাজ করে আমি সমাজে এত লাঞ্ছনা ভোগ করেছি, তার কথাই আপনাকে বলবো।

তখন ভাদ্র মাস। বেলা বোধ হয় সাড়ে ছটা বেজেছে। মহম্মদপুরের মাঠ দিয়ে বাড়ী আসছিলুম। আকাশে একটু একটু মেঘ দেখা দিচ্ছিল। হঠাৎ ঝড় এলো। কালো কালো মেঘ এসে সমস্ত সৃষ্টিকে ঘিরে ফেল্লে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো। বজ্রের কড় কড় ধ্বনি কর্ণবধির করে তুললে। মুষলধারে বারিপাত আরম্ভ হলো। মনে হল, যেন শমনের অগণ্য বাহিনী এসে সৃষ্টিকে লয় করবার জন্য তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করছে। আল্লার নাম জপ করতে লাগলুম, ভয় দূর হলো না। শঙ্কিত চিত্তে চারিদিকে চাইতে লাগলুম। হঠাৎ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমার অন্তর - বাহিরকে আলোকিত করে তুললো।

দেখলুম, আকাশের পশ্চিম কোণটী সোনার মেজের মত চক্ চক্ করছে। আর সেই উজজ্বল ভূমিকার উপর কালীর কালো অথচ এক স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত মনোমোহিনী মূর্ত্তি নরকপালের হার গলায়, বাম করে রুধিরাক্ত খড়্গ নিয়ে স্বামীর ভূতলগত শরীরের উপর পা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, -আর নিজের প্রলয়লীলার কথা ভেবে যেন লজ্জায় রসনা ছেটেচেন।

তার সেই ভীষণ প্রলয়ঙ্করী মুর্ত্তির মধ্যেও যে এক অভয় - বাণী প্রচ্ছন্ন রয়েছে। দক্ষিণ বাহুযুগলের একটি দিয়ে সঙ্কেত করে যেন বলেছেন, ''বাছা, আশ্বস্ত হও, ভয় করো না। তোমাকে আমি মারবো না। আর দ্বিতীয় বাহু দিয়ে ভূতলগত মহাদেবকে দেখিয়ে বলছেন ''দেখছো না বাছা, ভুলে এঁর গায়ে পা দিয়ে কি লজ্জায় আমি পড়েছি। সত্যের দলন, সুন্দরের দলন, তার ধর্ম্মের দলন কী আমার দ্বারা হতে পারে? আর আমার এই প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখে তুমি ভীত হয়ো না। সৃষ্টিই আমার ধর্ম্ম, লয় কেবল আমার খেলা। সৃষ্টি রক্ষার জন্যই সংহার, নাশের জন্যই লয়। মৃত্যু মিথ্যা, জীবন সত্য। তোমার মৃত্যু নাই, তুমি নিঃশঙ্ক-চিত্তে ঘরে ফিরে যাও।

কথাগুলি যেন কোন স্বর্গীয় বীণার ভৈরব মধুর ঝঙ্কারের মত আমার হৃদয়তান্ত্রীকে আঘাত করে বেজে উঠলো। আমার চোখ তখন আপনা থেকেই বুজে এলো। ভক্তিভরে সেই বিজন প্রান্তরে আমি সেই অলৌকিক মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে প্রণাম করলুম। ভাবের আবেগে আমার মন-প্রাণ অভিভূত হয়ে গেল।

প্রকৃতিস্থ হয়ে যখন চোখ খুলে চাইলুম তখন দেখি বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়েছে, ঝড় থেমে গেছে। কালো কালো মেঘগুলো ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। আর অস্তগামী সূর্যরশ্মিতে আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিস্ময়াভিভূত চিত্তে বাড়ী ফিরলুম। আর সেই দিন থেকে আমার কালী পূজা আরম্ভ হলো।''

আমি একটু বিদ্রুপের স্বরে বললুম, ''ওটা একটা Optical illusion (দৃষ্টির বিকার)। তোমার মন অত্যন্ত কল্পপ্রবণ, আর তোমার চিন্তা visual current -এ (দৃষ্টির ধারায়) প্রবাহিত হয়। প্রকৃতির সেই প্রচণ্ড প্রলয়াভিনয়ের মধ্যে তোমার মনের কালীমূর্ত্তি উত্তেজনার তাড়নে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে দিগন্তের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কালী যদি তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়েছেন মনে করে থাকো, তাহলে ভুল বুঝেছো।''

তখন আলি হোসেনের ভাবব্যঞ্জক মুখে আবার সেই বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠলে। কাতর কণ্ঠে সে বল্লে- ''আমার কথায় আপনাদের বিশ্বাস হবে না। আমি নিজের চক্ষে দেখেছি, তা কেমন করে অবিশ্বাস করি বলুন?'' ম্লান মুখে ব্যথিত চিত্তে সে আমায় বিদায় অভিবাদন জানাল। তার অবস্থা দেখে আমার বড় দুঃখ হলো। বললুম, ''আচ্ছা, এখন এসো। তোমার উপর যাতে কোন অত্যাচার না হয় সে চেষ্টা আমি করবো। আর তুমিও একবার চেষ্টা করে দেখো সেই কল্পনার ছবি মন থেকে সরাতে পারো কি না!''